বিপ্লবের রবীন্দ্র পূজা : বান্দার দাসত্বরীতি বান্দাকে বানিয়েছে দাস!

অভিজিৎ রায়

বিপ্লবের 'রবীন্দ্রভক্তি আর রবীন্দ্র বন্দনা'র মাহাত্ম্য দেখে উপরের লাইনগুলোর চেয়ে ভাল কোন লাইন এ মূহূর্তে মনে পড়ল না। 'বান্দার দাসত্বরীতি বান্দাকে বানিয়েছে দাস'! লাইনটি ফরহাদ মজহারের *এবাদতনামার*। এবাদত থেকে মুক্তি পাওয়াটা দূরূহ বটে! কেউ সারা জীবন মুহম্মদের এবাদত করেন, কেউ মা কালীর, কেউ বা রবীন্দ্রনাথের। এবাদতের একটা বড় সমস্যা হল প্রাণ-প্রভুর দোষগুলো দেখা যায় না। সেটা আল্লাই হোক, যীশুই হোক, মা-কালীই হোক আর রবিঠাকুরই হোক। এই দেখুন না- তথাকথিত 'ইসলাম বিদ্বেষী'রা যখন কোরান থেকে শত সহস্র উত্তেজক আক্রমনাত্মক ভার্স আর সুরার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, তখন ধর্মবাদীরা বিপ্লবের মতই ছ' সাতটি ঝড়া পাতার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন; বলেন কই, কোরানে তো অনেক ভাল ভাল কথা আছে। কোরানে বলেছে, ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নাই, আমার ধর্ম আমার কাছে, তোমার ধর্ম তোমার... এগুলো। তারপরই কিন্তু তোতলাতে থাকেন। বিপ্লবও বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্য সন্ধান করে ছ'টি শুকনো ঝরাপাতার সন্ধান পেয়েছেন; আর তাতেই নিজের প্রণতি জানিয়েছেন। সে ঝরা পাতা গুলো হল : *নষ্টনীড়, ল্যাবরেটরি, রবিবার,নামঞ্জুর গল্প, অধ্যাপক* এবং *স্ত্রীর পত্র*। উদাহরণ হাজির করেছেন ছ'টির কিন্তু বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন একটি মাত্র ঝরাপাতার - *নষ্ট নীড়*। একটিমাত্র গল্প আর কিছু অবান্তর উপমা (তেন্ডুল্কার, আকরাম, শ্রীকান্ত, ইয়র্কার, ইনসুইং, অনড্রাইভ, গ্যালারি শো আর আর কিছু ক্রিকেটীয় আগডুম বাগডুম যা আমার লেখার সাথে একেবারেই সঙ্গতিহীন) হাজির করে ঘোষনা করেছেন, রবিবাবুর নায়িকারা ভিকটোরিয় পুরুষতন্ত্রের প্রতি নাকি চপোটাঘাত করেছে। আসুন পাঠক, হাল্কা কথায় ভেসে না গিয়ে আমরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখি চপোটাঘাতটা আসলে কার উপর।

বিপ্লব কিছুদিন আগে ধর্ম নিয়ে একটা সিরিজ লিখতে শুরু করলেন, তখন ঘোষণা করেছিলেন, তার চোখে চিত্রাঙ্গদাই নাকি 'আলটিমেট নারীমুক্তি'! আমি আমার লেখায় দেখিয়েছি এটি ভুল বিশ্লেষণ বরং *চিত্রাঙ্গদার* মাধ্যমে কিভাবে একটি ছক-ভাঙা নারীকে ছকের মধ্যে পুনর্বিন্যস্ত করা যায় সেটিই সফলভাবে দেখিয়েছেন রবিবাবু। 'আলটিমেট নারীমুক্তি' নয় বরং এতে প্রমাণ করা হয়েছে নারী যতই সাহসী হোক না কেন, নিজ প্রতিভায় স্বাধীন ও সায়ত্ত্বশাসিত হবার অযোগ্য; সে হতে পারে বড়জোর পুরুষের সহচরী। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার সাথে মিল আছে টেনিসনের *প্রিন্সেস এর*, যাতে একইভাবে দেখানো হয়েছিলো কিভাবে এক বিদ্রোহী নারীকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে স্বামীর সেবিকা বানিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার যায়। আমার লেখার পর বিপ্লব তার ছ'টি ঝড়া পাতার তালিকায় কিন্তু তার 'আলটিমেট নারীমুক্তি' *চিত্রাঙ্গদাকে* স্থান দেন নি। স্থান দেননি *ঘরে-বাইরেকেও*, যদিও ঘরে-বাইরে সম্বন্ধেও একটা সময় তার উঁচু ধারণা ছিল বলে জানি। ঘরে বাইরে উপন্যাসে 'পথভ্রষ্ট' বিমলাকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রায়শ্চিত্ত করাননি, তার মুখে উচ্চারণ করিয়েছেন সতীত্বের মহিমা। শুধু তাই নয় বিমলাকে তিনি 'পাপের শাস্তিস্বরূপ' বিধবাও করেছিলেন। এগুলোর প্রত্যেকটিতেই কিন্তু লেখক সত্ত্বা প্রকাশ পেয়ে যায়, প্রকাশ পায় লেখকের অনৈতিক আদর্শগত ক্ষুদ্রতা। আমার ধারণা *চিত্রাঙ্গদা* আর *ঘরে-বাইরে* কে যেভাবে তার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন, আমার আজকের লেখার পর অবশিষ্ট ঝড়াপাতাগুলোও বিপ্লব বাদ দেবেন।

বিপ্লবের ছ'টি ঝরাপাতার একটি হল *স্ত্রীর-পত্র* যেটিকে বিপ্লব অযথাই মহিমান্বিত করেছেন। এটির সমাপ্তিটি একটু ব্যতিক্রমধর্মী হলেও শেষপর্যন্ত সেই পুরোনো ছক-বাধা রাবিন্দ্রীক রচনাই। এ রচনায় সাংসারিক শত অন্যায় অত্যাচারের পরও রবীন্দ্রনাথ তৈরী করতে চেয়েছেন এক 'সহিষ্ণু' পত্নী মৃণালের ভাবমূর্তি।

শত অত্যাচারেও স্বামীর বন্দনায় মুখর হয় সে : 'তোমার চরিত্রে এমন কোন দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি।' ভাসুর সম্বন্ধেও তার একই মত। সাধারণত: মেয়েদের বুদ্ধি যে কম হয় তাও মৃণালের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন 'নারীর মিত্র' রবিঠাকুর :

> 'ঘরের বৌ-এর যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে তার চেয়ে অনেকটা বেশী দিয়ে ফেলেছেন।'

নারী হয়ে নারীর প্রতি অবমাননাসূচক মন্তব্য মৃনাল বেশ ক'বারই করেছে প্রবন্ধটিতে। যেমন একবার বলেছে,

> 'তোমাদের বড় বৌ এর রূপের অভাব মেজো বৌকে দিয়ে পূরণ করবার জন্য তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিলো।'

বড় জা কে নিয়ে এ ধরণের রূপের খোঁটা মৃণাল অনেকবারই দিয়েছে, যেমন একবার বলেছে :

> 'আমাদের বড় জা এর বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড় কিছু ছিল না, রূপও না, টাকাও না'।

এগুলো স্রেফ মৃণালের কথা বলে ভেবে নিলে ভুল হবে। মৃণালের এ উক্তিগুলোর মধ্য দিয়ে উঠে আসে রূপ জিনিসটাকে কেমন 'মহার্ঘ্য' বস্তু বলে ভাবতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৃণালের বড় জা এর বোন বিন্দু সম্বন্ধেও মৃণালের এ ধরণের অনেক উক্তি আছে। যেমন, মৃণাল এক জায়গায় বিন্দুর রূপ নিয়ে স্বামীকে বলছে :

> তুমি তো জান, দেখতে সে এতই মন্দ ছিল যে, পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত, তবে ঘরের মেজেটার জন্যই লোকে উদ্বিগ্ন হত।

আরেক জায়গায় বলেছে :

> আমার যে রূপ ছিল সে কথা আমার মনে করবার কারণ বহুদিন ঘটেনি - এতদিন পর সেই রূপটা নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী মেয়েটি।

যে বুদ্ধির জন্য মৃণালের মা পর্যন্ত মেয়ের জন্য 'বিষম উদ্বিগ্ন' ছিলেন, সেই বুদ্ধিমতি মৃনালকে গল্পের শেষ দিকে দেখা যায় নিজের গয়না বেঁচে বিন্দুর বিয়ে দিতে - অজ্ঞাত এক পাগল স্বামীর সাথে। বর পক্ষ থেকে একটিবার কেউ মেয়েকে দেখতে পর্যন্ত আসেনি, তারপরও বিন্দুর হবু স্বামী নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ সৃষ্টি হয় না 'বুদ্ধিমতি' মৃণালের মনে। কেবল উপন্যাসের শেষে এসে আমরা দেখি ধর্ম আর পুরুষদের শঙ্খলিত শরৎচন্দ্রের নায়িকারা যেমন বৃন্দাবন আর কাশী গিয়ে সমাজ-শৃঙ্খলকে আশ্বস্ত করে, মৃণালও তেমনি চলে যায় সেই শ্রীক্ষেত্রে। শেষ সম্বল 'জগদীশ্বরই' হয় তার আশ্রয়। সম্ভবত মৃণালের চলে যাওয়াটাই হয়ত বিপ্লবের কাছে 'ব্যতিক্রম', আর কাজেই সে হয় মহিমান্বিত, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে তা নয়। ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ প্রসঙ্গে লেখেন :

> 'যোগাযোগের কুমুদিনী ফিরে যায় রাক্ষসতুল্য স্বামীগৃহে। স্ত্রীর পত্রে মৃণালের কাজটাই যা একটু ভিন্ন ধরনের। একান্নবর্তী পরিবারের দেওয়াল ঘেরা চৌহদ্দিতে সে আর ক্ষয় করবে না তার

> নিজের জীবনকে। কিন্তু কোথায় যাবে মৃণাল? আপাতত গেছে সে তীর্থে, থাকবে হয়ত কোন ধর্মাশ্রমে। সেও তো এক বন্দিনীরই জীবন।'

বন্দিনীর জীবন তো বটেই। কিন্তু 'সমাজ সচেতন' রবিঠাকুর সম্ভবত তাতেই দেখেছেন মুক্তি। তাই মীরা বাঈ-এর কন্ঠে গানের মাধ্যমে বলিয়েছিলো :

> 'ছাড়ুক বাপ ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু! তাতে তার যা হবার তাই হোক।'

ল্যাবরেটরি বিপ্লবের আরেকটি প্রিয় ঝরাপাতা, যা দিয়ে তিনি রবীন্দ্রবন্দনার কাজটি সারতে চান। অথচ এই গল্পেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কিভাবে মাতৃতুল্য সোহিনী তরুণ রেবতীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রাণাম করল; রবীন্দ্রনাথ গল্পের মাধ্যমে এর মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন - 'শত হলেও সোহিনী ছত্রির মেয়ে, আর রেবতী ব্রাহ্মণের ছেলে'। এগুলো কুপ্রথার মধ্যেই কি প্রগতি খোঁজেন বিপ্লব? ল্যাবরেটরিতে রেবতীকে যখন আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন নীলিমাকে খাদ্যের মতই পরিবেশন করা হয় এক রমণীয় সাজে সাজিয়ে - 'পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসী শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বাসন্তী রঙের কাঁচুলি।' রবিঠাকুরের কাছে এই নারীর ভুবণমোাহিনী সৌন্দর্যটাই মুখ্য; তাই তার কাছে নারীকে শিক্ষিত করে তুলবার চেয়ে, নারীর একটা 'ভাল গতি' করবার চেষ্টাটাই হয়ে ওঠে মুখ্য। ভাল গতি অবশ্যই 'সুপাত্রের সন্ধান'। তাই দেখা যায় বিত্তবান সোহানী তার মেয়ে নীলিমাকে বিজ্ঞান চেখাতে কখনও ব্যস্ত হয় না। কারণ 'তরুণ রেবতী ভট্টাচার্যের প্রতি তার দৃষ্টি পড়েছিল'। রেবতীকে পাওয়া যাবে মেয়েলি 'কূট-বুদ্ধিতে', তা নিটোল ছন্দে জানাতেও কসুর করেননি রবিঠাকুর :

> 'মেয়েলি বুদ্ধি বিধাতার আদি সৃষ্টি, যখন মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপে ঝোপে, যেই রক্ত ঠান্ডা হয়ে বেরিয়ে আসে সনাতনী পিসিমা।'

এসমস্ত প্রথাগত আপ্তবাক্যের মধ্যেই সম্ভবত প্রগতি আর নারীমুক্তি খুঁজছেন ডঃ বিপ্লব পাল!

রবিবার,নামঞ্জুর গল্প, অধ্যাপক গল্পে কি ধরণের নারীমুক্তি পেয়েছেন বিপ্লব তা পরিস্কার করেন নি। কাজেই আমার পক্ষেও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে না সেগুলোর নারীবাদী চরিত্রগুলোকে! দু' চারটি নারী-প্রগতি মার্কা কথা বার্তা যদি থেকেও থাকে এ দিক ও দিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এর বিপরীতে রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে আমি দেখাতে পারব অন্ততঃ শ'খানেক নারীপ্রগতি বিমুখ উক্তি, আর দষ্টান্ত দিতে পারব অগনিত প্রথামান্য নারী চরিত্রের। 'জাতক' ও 'পঞ্চ তন্ত্র' দিয়েই শুরু করি । নারায়ণ চৌধুরী পরিস্কার করেই বলেছেন :

> 'নীতি গল্পের সহজ সরল গল্পগুলোর পাশে সমাজস্থিতির কেন্দ্রবর্তিনী নারী চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। নিঃ সঙ্কোচে বলা যেতে পারে কাহিনীগুলো নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবধক নয়।'

স্ত্রী শিক্ষায় রবিঠাকুর স্তব করেছেন মেয়েদের চিরন্তন মেয়ে হয়ে থাকবার প্রথাটিকে। যদিও 'জ্ঞান প্রাপ্ত' আদমের মত নারী শিক্ষার বাস্তবতাটুকু অস্বীকার করতে পারেন না, তবুও দাবী করেন মেয়েদের পৃথক শিক্ষার, যা 'মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবে' :

> ‘মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপর মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা, তার একটা বিশেষত্ব আছে।’

পুনরাবৃত্তি গল্পে নারী চরিত্র রুচিরা কেন্দ্রীয় চরিত্র, যাকে রবিঠাকুর নির্মান করেছেন নিজ হাতে। কাজেই সে গল্পে দেখা যায় এক অযোগ্য ছাত্র কৌশিক পড়াশুনায় কোন অনুরাগ না থাকা সত্ত্বেও অধ্যাবসায়ী রুচিরাকে একেবারে কোনঠাসা করে ফেলে। আফটার অল, কৌশিক পুরুষ, আর রুচিরা নারী। নারীর বুদ্ধি তো কমই হতে হবে। কাজেই শত পড়াশুনা করেও কৌশিকের সাথে রুচিরা পারবে কেন! তাই অধ্যাপকের মুখ দিয়ে রবিঠাকুর উচ্চারণ করিয়েছেন :

> ‘কপিল-কনাদের নামে শপথ করে বলছি, আর কখনো স্ত্রী ছাত্র নেব না’।

খাতা গল্পে দেখা যায় পড়াশুনা করতে গিয়ে উমা কি বিষম বিপদে পড়েছে। লেখাপড়া যে মেয়েদের কাজ নয়, বরং লেখা পড়া শিখলে যে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা তা বোঝাতে রবিঠাকুর প্যারীমোহনের মুখ দিয়ে করেছে সেই পুরাতন প্রথাবাদী উচ্চারণ:

> ‘লেখাপড়ার শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুং শক্তির আবির্ভাব ঘটে, তবে পুং শক্তির সহিত পুং শক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয় শক্তির উৎপত্তি হয়, যদ্বারা দাম্পত্য শক্তি বিনাশ শক্তির মধ্যে বিলীনসত্ত্বা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়।’

লেখা পড়া শিখায় ‘পুং শক্তির সহিত পুং শক্তির প্রতিঘাতে’ যে নারী বিধবা হয়, এ তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা হলেও বিশ্বাসী ছিলেন, তাই *ঘরে বাইরে*-তে দেখা যায় লেখা পড়া জানা বিমলা পাপের শাস্তি স্বরূপ বিধবা হয়েছে।

উদাহরণ হাজির করা যায় অজস্র। *ঘাটের কথার* কুসুম কিংবা *শাস্তি* গল্পের চন্দরা, *প্রতিবেশিনী* গল্পে বাল্যবিধবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মস্করা, *মনিহারায়* মাস্টার মশাইয়ের নারী বিদ্বেষী বক্তব্য, *সংস্কার* গল্পে গলা দাসী, আর কলিকা চরিত্র, *পাত্র-পাত্রী* গল্পে সনৎকুমারের মা, ব্রাহ্মণ কন্ট্রাকটরের স্ত্রী, সৌদামিনীর স্ববিরোধিতা, সম্পাপ্তি গল্পে অপুর্বের মা ও মৃন্ময়ী চরিত্র এধরণের হাজারো দৃষ্টান্ত হাজির করে রবীন্দ্রনাথের প্রথাগত চিন্তা-চেতনাকে তুলে ধরা যায়। এমনকি মরে যাবার পরও নারীকে শান্তি দেননি রবীন্দ্রনাথ। মরে গিয়ে অতৃপ্ত আমকনার জ্বালায় কেমন ভয়ঙ্কর ‘পিশাচী’ হয়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন *ক্ষুধিত পাষাণ* গল্পে। সাদ কামালী *রবীন্দ্রনাথের গল্পঃ নারী প্রসঙ্গ* শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এ জন্যই বলেছেন :

> ‘রবীন্দ্রনাথের পুরুষ চরিত্রগুলো শেষ পর্যন্ত নারী প্রজাতিটিকে মানুষ হিসেবে মানতে নারাজ। গল্পের পুরুষেরা রাজা, জগতের সকল শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত, তারা আমলা কন্ট্রাকটর, গবেষক ব্যবসায়ী, পুরোহিত এবং সংসারের নৈতিক ও অর্থব্যবস্থার অভিভাবক।’

নষ্ট নীড় গল্পের উদাহরণ হাজির করেছেন বিপ্লব। কিন্তু নষ্ট নীড়ে রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনে ঘটে যাওয়া কাদম্বরী দেবের সাথে ট্র্যাজিডিগত মিলটুকু ছাড়া মূলতঃ কিছুই চোখে পড়ে না। নিজের কৃতকর্মের সাফাই রবিঠাকুর আরো অনেকবারই গেয়েছেন তার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের রাজনীতি রবিঠাকুরের কাছে বরাবরই ছিল খুবই জঘন্য, তাই *ঘরে বাইরে* তে বিপ্লবীদের চরিত্রহীন করে এর সমাপ্তি টানেন। রবীন্দ্রনাথের স্ববিরোধিতাগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, চারুর ‘না-থাক’ পুরুষতন্ত্রের প্রতি

কোনভাবেই চপোটাঘাত নয়, বরং হয়ে ওঠে নারীর 'অভিমানী কান্না'। চারুর 'বিদ্রোহ' যে অভিমানী কান্না, তা বোঝা যায় ভুপতির চলে যাওয়ার আগে চারুর করুণ মিনতিতে :

> 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেও না।'

চারু ইবসেনের নোরার মত বিদ্রোহী নয়, রবীন্দ্রনাথ চাইলেও নোরা যা করেছে করাতে পারতেন না চারুকে দিয়ে! কারণ তিনি তিনি নোরা হেলমারের বিদ্রোহের প্রকৃতি অনুভব করার মতো সংবেদনশীল ছিলেন না। তাই ইবসেনের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ হন মুখর :

> নরোয়েদেশীয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন-রচিত কতকগুলি সামাজিক নাটকে দেখা যায়, নাট্যোক্ত অনেক স্ত্রীলোক প্রচলিত সমাজবন্ধনের প্রতি একান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছে, অথচ পুরুষেরা সমাজপ্রথার অনুকূলে। এইরকম বিপরীত ব্যাপার পড়ে আমার মনে হল, বাস্তবিক, বর্তমান য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থাই নিতান্ত অসংগত।

যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন ভিকটোরীয় পুরুষতন্ত্রের ধারক, তিনি চারুকে দিয়ে ভিকটোরিয় পুরুষতন্ত্রের গালে চপোটাঘাত করেছেন, বিপ্লবের এ তত্ত্ব বড়ই হাস্যকর শোনাচ্ছে।

বিপ্লবের চোখে আরেকজন 'প্রগতিশীল' নারীবাদী হলেন শরৎচন্দ্র, এক নারীর মূল্য দিয়েই নাকি নারীমুক্তির স্তব করা যায়! যা হোক, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার মূল্যায়ন হল, উনি চমৎকার গল্প বলেন, তবে তার 'মহান গল্প' নারীকে সুবেশিতভাবে দীক্ষিত করার আর নারীকে পুরুষতন্ত্রের ছাঁচে ঢালাই করার ফুসলানি ছাড়া অন্য কিছু নয়। শরৎচন্দ্র নারীকে করে তুলতে চান সতীত্ব, আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ তিতিক্ষা আর মর্ষকামিতার হোমশিখা রূপে। যে শরৎচন্দ্রকে নারীমুক্তির এক মহান প্রবক্তা মনে করেন বিপ্লব, তিনি কি জানেন শরৎচন্দ্র অনিলা দেবী ছদ্মনামে কি ভয়ঙ্কর প্রগতি বিরুদ্ধ কথাবার্তা বলেছিলেন? শুনুন আমার মুখে :

> 'সতীত্বের বাড়া নারীর আর গুন নাই, ... এই সতীতও যে নারীর কত বড় ধর্ম হওয়া উচিৎ, রামায়ন, মহাভারত ও পুরানাদিতে সে কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা হইয়া গিয়াছে।' ইত্যাদি।

বরীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র এরা দুজনেই প্রথামান্য সাহিত্যিক। এরা দুজনেই প্রতিভাবান সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও আসলে পালন করেছেন পুরুষতন্ত্রের অনুগত দীক্ষা প্রচারকের ভূমিকা। তারা চিরন্তন বাঙালী নারী-ভাবমূর্তি তৈরীতে যেমন অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন, তেমনি নারীদের প্রলুব্ধ, বিভ্রান্ত ও দীক্ষিত করার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা অতুলনীয়। তারা যেন 'নারীর প্রিয় বান্ধবীরূপী পেছন থেকে ছুরি মারা মহাশত্রু বিভীষন'! চিনির সরবত বানিয়ে পরিবশন করেছেন তাঁদের অসাধারণ সব উপন্যাস - তৈরী করেছেন অসাধারণ উপায়ে কিছু পুরুষতান্ত্রিক গৎবাধা ছক : নারী সর্বংসহা, অক্রিয়, সহিষ্ণু, অবুঝ, অযৌক্তিক, নিরবয়ব, লাজুক, মৌন, রহস্যময়ী, ছলনাময়ী, ত্যাগী, সেবিকা, পতিপ্রাণা, লাস্যময়ী, ভঙ্গুর, সতী, অনুগত, নিঃশব্দ, অভিমানী ইত্যাদি। শুধু এই দু'জন নন, তাদের সমসাময়িক এবং তাদের পরবর্তী নানা মাপের ঔপন্যাসিকদের যারা পরিচিত হয়েছেন 'আধুনিক লেখক' হিসেবে, তারাও একইভাবে নারীকে উন্মোচিত করতে গিয়ে নিজেরাই বন্দি হয়েছেন একই গন্ডিতে। তারা নানা বিষয়ে উপন্যাস রচনা করেন, নানাভাবে মূর্ত করে তোলেন সমকালের বাস্তবতা ও আধুনিক জীবনের রূপ। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়, 'বিমূর্ত' ও 'বিশুদ্ধ' শিল্পসৃষ্টিই তাদের একমাত্র ব্রত; শিল্পের মধ্য দিয়ে জীবনের

প্রতিলিপি রচনার ব্রতে তারা যেন আত্মোৎসর্গীকৃত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তা নন। তারা নিজেদের দাবী অনুযায়ী 'আধুনিক' কিন্তু তাদের চেতনাগত পুরুষতান্ত্রিক বোধ বিশ্বাসের অন্ধকারে পরিপূর্ণ। আসুন প্রিয় পাঠক, আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই সেই 'আধুনিক' রবীন্দ্রনাথকে যিনি 'বিমূর্ত' সাহিত্য রচনার পাশাপাশি আমাদের উপহার দিয়েছেন আবিস্মরণীয় কিছু নারীপ্রগতিবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সংলাপ। আর সেজন্য তার গল্প-উপন্যাস থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকানো দরকার তার আত্মজীবনীতে, প্রবন্ধে, ব্যক্তিগত পত্রালাপে আর বক্তৃতা বিবৃতিতে; তবেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে বিপ্লবের 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' দেবতুল্য রবিঠাকুরের সত্য পরিচয় ও ভূমিকা। আর সে জন্য আমাদের পড়ে নিতে হবে *রমা বাই এর বক্তৃতা উপলক্ষে*, *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য*, *জাপানযাত্রী*, *পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী*, *স্ত্রী শিক্ষা*, এবং *নারী* প্রবন্ধ ক'টি।

নারী বিদ্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্য আমরা পাই আসলে তার *পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী* প্রবন্ধে। যেখানে নজরুল শুনিয়েছেন, 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর' সেখানে রবীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন সম্পুর্ণ বিপরীত কথা। রবীন্দ্রনাথ সভ্যতা থেকেই বের করে দিয়েছেন নারীকে, তিনি মনে করেছেন **সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের সৃষ্টি**। তিনি বলেন :

> 'সাহিত্য কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধি ব্যবস্থায় মিলিয়ে আমরা যাকে সভ্যতা বলি সে হল পুরুষের সৃষ্টি।'

আরো কিছু নমুনা পেশ করা যাক। যেমন, রবীন্দ্রনাথ কখনই মেনে নিতে পারেননি পাশ্চাত্যের নারীমুক্তি-আন্দোলনকারীদের, তিনি ভেবেছেলেন ভারতীয় নারীরা পাশ্চাত্যের মেয়েদের তুলনায় অনেক ভাল আছে, আর পাশ্চাত্যের **'নারী স্বাধীনতা' একটি ভ্রান্ত ধারণা, স্রেফ নাকি সুরে কান্না** । এ ধরনের চরম প্রতিক্রিয়াশীল কথাবার্তার নমুনা আমরা পাই *রমা বাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে* প্রবন্ধে। তিনি বলেন :

> আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগতই নাকী সুরে বলছে, আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে কেবল এই হচ্ছে যে, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবন্ধনহীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে; অথচ সে-বন্ধন ছেদন করবার কোনো উপায় নেই।

আরেক জায়গায় **নারী আন্দোলনকে 'কোলাহল' বলে করেছেন বিদ্রুপ** :

> আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসঙ্গত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়।

সবচাইতে বেদনাদায়ক ব্যাপারটি হল, তিনি **নারীকে তুলনা করেছেন গৃহভৃত্যের সাথে** আর ভৃত্যের প্রভুভক্তির বন্দনা করে বলেছেন - এতে করে 'ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না।' :

> পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত; তাতে এই হত যে, চরিত্রের ওপর অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমনকি অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন করত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না।

ভিক্টোরীয়দের মতো তিনি নারী পুরুষকে প্রাকৃতিকভাবেই দুটি বিপরীত ও পরিপূরক জাতির সদস্য বলে মনে করেন, আর মনে করেন **মেয়েদের রূপটাই শেষ কথা** :

> আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনি রূপে শ্রেষ্ঠ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনি হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ; তাই স্ত্রীপুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে। স্ত্রী লোকের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প ব'লে স্ত্রী শিক্ষা অত্যাবশ্যক এটা প্রমাণ করবার সময় স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান একথা গায়ের জোরে তোলবার কোন দরকার নেই।

রবীন্দ্রনাথের মতে **পুরুষাধীনতা এবং পতিভক্তিই নারীর জন্যে ধর্ম** :

> পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম। আজকাল একরকম নিস্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসার সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্ছে। কর্তব্যের অনুরোধে যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে তো স্বামীর অধীন নয়, সে কর্তব্যের অধীন।

প্রকৃতির দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলতে চান **নারীর নিয়তি হচ্ছে পুরুষাধীনতা** :

> নানা দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সংসার কল্যান অব্যাহত রেখে স্ত্রীলোক কখনো পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে না। প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের অধীনতা কেবল তাদের ধর্মবুদ্ধির উপরে রেখে দিয়েছেন তা নয়, নানা উপায়ে এমনই আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে, সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য পৃথিবীতে এমন অনেক মেয়ে আছে পুরুষের আশ্রয় যাদের আবশ্যক করে না, কিন্তু তাদের জন্যে সমস্ত মেয়ে-সাধারণের ক্ষতি করা যায় না।

পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন **মেয়েরা যে-শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট।** আর বারবার যুক্তি দিয়েছেন যে, **নারীর প্রতিভা নেই, পৃথিবীতে কোন বড় নারী প্রতিভা জন্মেনি**, মিল যা খন্ডন করেছেন নারী-অধিনতায় (১৮৬৯):

> মেয়েরা এতদিন যা শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট ছিল।...স্ত্রী জাতির মধ্যে প্রথম শ্রেনীর কবির আবির্ভাব এখনো হয়নি। মনে করে দেখো, বহুদিন থেকে যত বেশি মেয়ে সংগীতবিদ্যা শিখেছে এত পুরুষ শেখেনি। ইউরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পিয়ানো ঠং ঠং এবং ডেরেমিফা চেঁচিয়ে মরছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'টা Mozart এবং Beethoven জন্মাল?

এ ধরনের উদ্ধৃতি হাজির করা যায় অজস্র। উক্তিগুলো থেকে বোঝা যায় রবিবাবু শুধু 'বিমূর্ত' বা 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যচর্চাই করতেন না, সেই সাথে সে সময়কার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা-প্রবাহে বলিষ্ট মত দিয়েছেন, ভূমিকা রেখেছেন। মন্তব্য করেছেন নারী-পুরুষের সম্পর্ক আর সমাজে নারীর স্থান নিয়েও। যেমন, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কিভাবে রবিঠাকুর স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েন নারীমুক্তিবাদী কৃষ্ণভাবিনী দাসের সাথে। কৃষ্ণভাবিনী তার 'শিক্ষিতা নারী' বইয়ে দাবি করেছিলেন নারীশিক্ষা, চাইছিলেন কিছুটা স্বাধীনতা। কিন্তু বিমূর্ত সাহিত্যের কর্ণধার রবিঠাকুর আবারো 'প্রকৃতির দোহাই' দিয়ে কৃষ্ণভাবিনীর দাবী নাকচ করে দিতে প্রয়াসী হন। একইভাবে রমা বাঈ এর বক্তৃতার পরও রবিঠাকুর পেশ করেছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল নারী-বিদ্বেষী বক্তব্য। এ গুলোকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করতেই হবে। এগুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে রুশো রাসকিনদের মতই প্রগতিশীলতার

লেবাসধারী এক প্রথাক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ! বিমূর্ত সাহিত্যের দোহাই পেড়ে এটি এড়িয়ে গিয়ে লাভ হবে না। বিপ্লব প্রায়শঃই বলেন, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম এদেরসবাইকে কালের প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে। কালের দোহাই পেরে আসলে মনু, মুহম্মদ থেকে রবিবাবু - সবাইকেই ধোয়া তুলসীপাতা বানানো যায়। যে রবিবাবুর 'নারী-বিদ্বেষী' উচ্চারণগুলো সইতে না পেরে কালের দোহাই পারছেন বিপ্লব, তাকে একটু পেছন ফিরে তাকাত হবে, দেখতে হবে কিভাবে বিদ্যাসাগর এবং রামমোহন তাদের নিজেদের কালে থেকেও নারী পুরুষের সামাজিক বৈষম্যকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক স্বচ্ছভাবে বুঝেছিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ পরিনত বয়সে এসেও উচ্চারণ করেছেন, সামাজিক বৈষম্য কিছু নয়, প্রকৃতিই বরং বৈষম্যের জন্য দায়ী - 'যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না', সেখানে রবীন্দ্রনাথের যখন নিতান্ত ছেলেবেলা, তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যায়সাগর *নারী অধীনতা* সম্পর্কে লিখেছেন :

> 'স্ত্রী জাতি -সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন; প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচার ও অন্যায়াচারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সে সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন।'

প্রকৃতি নয়, বরং, *স্ত্রী জাতি -সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন* এই ধরনের স্পষ্টকথা রবীন্দ্রনাথ না বলতে পারলেও তার অনেক আগেই বলতে পেরেছেন বিদ্যাসাগর। একই ধরণের কথা বলতে পেরেছেন এমনকি রামমোহনও, আর তাও আনেক আগেই। প্রকৃতি প্রেমিক রবিঠাকুরের মত 'প্রকৃতি'কে দোষারোপ না করে, বরং অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন নারী-পুরুষের সামাজিক লৈঙ্গিক রাজনীতিকে, এবং হিন্দু পিতৃতন্ত্রের নৃশংসতার প্রতি। ১৮১৮ সালে রামমোহন *সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদে* বলেন:

> 'স্ত্রীলোককে যে পর্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। ... স্ত্রী লোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে ২ উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহাদিগের পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদপ্রাপ্তির যোগ্যা নহে।'

নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক রাজনীতিটি খুব পরিস্কারভাবেই এখানে বুঝতে পেরেছেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। পিতৃতান্ত্রিক বল প্রয়োগে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে নারীর সমস্ত অধিকার, সৃষ্টি করা হচ্ছে সামাজিক বৈষম্য তা ধরা পড়েছে রাম মোহন ও বিদ্যাসাগরের চোখে, কিন্তু তাদের অনেক পরে জন্মেও সেই সত্যটি অনুধাবন করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। যেখানে 'আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে..' রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রক্ষিপ্ত বাক্যারলী থেকেই যেখানে পাওয়া যাচ্ছে পাশ্চাত্যের নারী জাগরনের আওয়াজ, সেখানে রবীন্দ্রনাথের নারী প্রগতি বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান শুধু কালের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে না, তুলে ধরে তার প্রথাগত সঙ্কীর্ণতাকেও। রবীন্দ্রনাথকে যদি 'কালের প্রেক্ষাপটে' বিচার করে ধোয়া তুলসিপাতা বানাতে চান বিপ্লব, তবে রাম মোহন আর বিদ্যাসাগরকে কোন মাপকাঠিতে বিচার করবেন তিনি?

রবীন্দ্র সমালোচনায় আক্রান্ত হয়ে শেষ খড় কুটো আঁকরে ধরতে চাইছেন বিপ্লব, ধর্মবাদীদের মতই! ধর্মবাদীরা যেমন সমালোচনায় আক্রান্ত হলে সমালোচনাকারীদের ভাল করে কোরাণ, মনু সংহিতা এগুলো ঠিক মতো আগা গোড়া পড়ে দেখবার ফতোয়া দেন, ঠিক তেমন করেই বিপ্লব বলেছেন :

> 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা করার প্রথম শর্তই হচ্ছে, তার সাহিত্যের পথে প্রবন্ধগুচ্ছ প্রথম থেকে শেষ শব্দ পর্যন্ত পড়ে ফেলা। সেটা পড়লেই অভিজিৎ বুঝতে পারত, সাহিত্যিকদের সাথে সমাজবিজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী, প্রতিবাদীর পার্থক্য কি!'

বিপ্লবের উক্তি থেকে দুটো জিনিস পরিস্কার বেরিয়ে আসে। প্রথমতঃ তার অহংবোধ। তিনি ধরেই নিয়েছেন অভিজিৎ রবীন্দ্র সাহিত্য আগা গোড়া পড়ে নি, কেবল তিনিই পড়েছেন। আর দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়তে বলেছেন বিপ্লব, কিন্তু কিভাবে পড়তে হবে তা বলেন নি। এখানেও কিন্তু ধর্মবাদীদের সাথে তার অদ্ভুত মিল লক্ষ্যনীয়! শত শত বছর ধরে ধর্মবাদীরা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ নিরন্তর পড়ে চলেছে, এবং অবলীলায় তাতে বিশ্বাস করে চলেছে। প্রতিদিন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার পরও অনেকেই আছেন যারা তাতে কোন ধরনের নারী প্রগতি বিরোধী স্লোক, ভায়োলেন্সের টিকিটিও সেখানে খুঁজে পাননা, কারণ তারা ধর্মগ্রন্থটিকে পাঠ করেন প্রেমময় দৃষ্টি দিয়ে, সংশয়বাদী দৃষ্টিকোন থেকে নয়। বিপ্লবও সম্ভবত রবীন্দ্রসাহিত্যকে ধর্মগ্রন্থ বানিয়ে ফেলেছেন, ফলে প্রেমময় দৃষ্টি থেকেই কেবল রবিঠাকুরকে আর তার সাহিত্যকে দেখছেন। এখানেই বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা। নিজের সীমাবদ্ধতাটুকু না বুঝে নিজেকে রাহুলদ্রাবিড় অথবা তেনডুলকার বানিয়ে আর তার প্রতিপক্ষকে কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত ভেবে যদি আনন্দ পেতে চান, তো পান না! মনে মনে মন-কলা খেতে চাইলে আর তসবি হাতে রবিঠাকুরের নাম জপতে চাইলে আমার আর কি বলার আছে বলুন! অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?